بسم اللہ الرحمن الرحیم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৬ জুলাই ২০১৮ মোতাবেক ৬ ওফা ১৩৯৭ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজকাল আমি বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করছি। ইতিহাস এবং বিভিন্ন রেওয়ায়েতে কোন কোন সাহাবীর জীবনচরিত এবং ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় কিন্তু এমন অনেকেই আছেন যাদের বৃত্তান্ত খুবই সংক্ষিপ্ত পাওয়া যায়। তবে যাইহোক, বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের কল্যাণে তাদের যে পদমর্যাদা রয়েছে সেটি স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত, তাই কয়েকটি ছত্র হলেও তা বর্ণনা করা উচিত। আজ যেসব সাহাবীর কথা উল্লেখ করা হবে তাদের মধ্যে কয়েকজন এমন আছেন যাদের (কথা) খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লেখ রয়েছে।

তাদের মাঝে সর্বপ্রথম রয়েছেন হযরত **সুবাঈ' বিন কায়েস বিন আইশাহ্**। কেউ কেউ তার দাদার নাম লিখেছেন আবাসা আর কেউ কেউ আয়েশাও লিখেছেন। যাহোক তিনি খাযরাজ গোত্রের আনসারী (সাহাবী) ছিলেন। বদর ও উহুদের যুদ্ধে (তিনি) যোগদান করেন। **{উসদুল গাবাহ্, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৪০৭, সুবাঈ' বিন কায়েস (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত}, {আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৪০৩, সুবাঈ' বিন কায়েস (রা.) ওয়া উবাদা বিন কায়েস (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}**

তার মাতার নাম খাদিজা বিনতে আমর বিন যায়েদ। তার এক পুত্র ছিল যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্, যার মা বনু জুদারা গোত্রের সদস্যা ছিলেন। সেই (পুত্র) শৈশবেই ইন্তেকাল করে। এ ছাড়া তার আর কোন সন্তান ছিল না। তার ভাই ছিলেন হযরত উবাদা বিন কায়েস। যায়েদ বিন কায়েস (নামে)ও হযরত সুবাঈ' এর একজন আপন ভাই ছিলেন।

দ্বিতীয় (সাহাবী) হলেন হযরত উনায়েস বিন কাতাদাহ্ (রা.)। উহুদের যুদ্ধের সময় তার ইন্তেকাল হয়। কেউ কেউ বলেন তার নাম ছিল আনাস। যাহোক, তার সঠিক নাম হলো উনায়েস। মুহাম্মদ বিন ইসহাক এবং মুহাম্মদ বিন উমর (তার নাম) উনায়েসই লিখেছেন। বদরের (যুদ্ধে) মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে যোগদান করেন এবং উহুদের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। তারও কোন সন্তান ছিল না। আরেকটি রেওয়ায়েত অনুসারে উহুদের যুদ্ধে শহীদ হওয়ার সময় খানসা বিনতে খেদাম হযরত উনায়েস বিন কাতাদাহ্‌র স্ত্রী ছিলেন। **{উসদুল গাবাহ্, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৩০৫-৩০৬, উনায়েস বিন কাতাদাহ্ (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত}, {আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৩৫৩-৩৫৪, ওয়া মিন বানী উবায়দ বিন যায়েদ, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}**

আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত মুলায়েল বিন ওবারাহ্ (রা.)। তার নাম সম্পর্কেও ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে। ইবনে ইসহাক এবং আবু নু'আয়েম তার নাম মুলায়েল বিন ওবারাহ্ বিন আব্দুল করীম বিন খালেদ বিন আজলান বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ আবু উমর ও কালবী মুলায়েল বিন ওবারাহ বিন খালেদ বিন আজলান বলে উল্লেখ করেছেন। মাঝ থেকে আব্দুল করীম বাদ পড়েছে। তিনিও খাযরাজের শাখা বনু আজলান গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। **{উসদুল গাবাহ্, পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ২৫১, মুলায়েল বিন ওবারাহ্ (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত}**

যায়েদ এবং হাবীবা তার সন্তান ছিলেন আর তাদের মা ছিলেন উম্মে যায়েদ বিনতে নাযালাহ্ বিন মালেক। হযরত মুলায়েল (রা.)'র বংশধারা এরপর আর বিস্তার করে নি। **[আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৪১৬, মুলায়েল বিন ওবারাহ্ (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}**

তাকে ইবনে খালেদ বিন আজলান বলা হতো। একটি রেওয়ায়েতে লেখা হয়েছে, বদরসহ অন্য সব যুদ্ধেই তিনি মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে যোগদান করেন। **(আল্ ইকমালু ফি রাফঈল ইরতিয়াবি আনিল মু'তালেফে, সপ্তম খণ্ড, পৃ: ২২২, বাবু মিলকানা ওয়া মালাকানা ওয়া বাবু মুলাইলিন ওয়া মুলাইকিন, মাকতুবাহ্ শামেলাহ্‌র উদ্ধৃতি)**

অপর এক সাহাবী হলেন, নওফেল বিন আব্দুল্লাহ্ বিন নাযলাহ্। তিনিও উহুদের যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেন। কেউ কেউ তার নাম নওফেল বিন সা'লাবাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন নাযলাহ্ বিন মালেক বিন আজলান বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন আর উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। তার বংশধারাও বিস্তার লাভ করে নি। {উসদুল গাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৬-৩৪৭, নওফেল বিন সা'লাবাহ্ (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত}, {আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪১৫, নওফেল বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}

আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত ওয়াদীয়া বিন আমর (রা.)। ইবনে কালবী তার নাম বর্ণনা করেছেন ওয়াদীয়া বিন আমর বিন ইয়াসার বিন অওফ আর আবু মা'শার তার নাম রিফা'আহ্ বিন আমর বিন জারাদ উল্লেখ করেছেন। তিনি বনু জুহায়না'র সদস্য ছিলেন, এটি বনু নাজ্জারের মিত্রগোত্র। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। হযরত রবীয়া বিন আমর তার ভাই ছিলেন। {আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৭, ওয়াদীয়া বিন আমর (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}, [আল্ ইসাবাহ ফী তামীযিস্ সাহাবাহ্, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৯২, রবীআতুবনু আমর (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে মুদ্রিত}

আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত ইয়াযীদ বিন মুনযের বিন সারাহ্ বিন খুন্নাস। তিনি বনু খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন আর আকাবা'র বয়আতে অংশ নিয়েছেন। মহানবী (সা.) হযরত ইয়াযীদ বিন মুনযের এবং আমের বিন রবীয়ার মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। মৃত্যুর সময় তার কোন সন্তান ছিল না। তার ভাই মা'কেল বিন মুনযেরও আকাবা'র বয়আতে এবং বদর ও উহুদের যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। {আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৩২, ইয়াযীদ বিন আল্ মুনযির (রা.) ওয়া আখুহু মা'কেল বিন ইয়াসার (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}, {উসদুল গাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৩, ইয়াযীদ বিন আল্ মুনযির (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত}

এরপর আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত খারেজাহ্ বিন হুমাইয়্যের আশজায়ী (রা.)। তার নাম সম্পর্কেও ইতিহাসে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। ইবনে ইসহাক তার নাম খারেজা বিন হুমাইয়্যের উল্লেখ করেছেন (আর) মূসা বিন উকবা তার নাম হারেসাহ্ বিন হুমাইয়্যের উল্লেখ করেছেন। ওয়াকদী তার নাম হামযাহ্ বিন হুমাইয়্যের বলে উল্লেখ করেছেন। তার পিতার নাম নিয়েও মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ হুমাইয়্যের উল্লেখ করেছেন, আবার কেউ কেউ তার পিতার নাম জুমাইরাহ্ এবং জুমায়ের লিখেছে। যাহোক, সর্বসম্মত মতে তিনি আশজা' গোত্রের সদস্য ছিলেন আর তারা বনু খাযরাজের মিত্র (গোত্র) ছিল। তার ভাইয়ের নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন হুমাইয়্যের আর তিনিও তার সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। {আল্ ইসাবাহ ফী তামীযিস্ সাহাবাহ্, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭০৪, হারেসাহ্ বিন হুমাইয়্যের (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ হতে ১৯৯৫ সালে মুদ্রিত}, {উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৪৯, হারেসাহ্ বিন খুমায়ের (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত}

এরপর হযরত সুরাকা বিন আমর (রা.)'র উল্লেখ রয়েছে। তিনি আনসারী ছিলেন। তার পুরো নাম ছিল সুরাকা বিন আমর বিন আতীয়্যা বিন খানসা আনসারী, অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে মূতার যুদ্ধে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তার পুরো নাম হলো সুরাকাহ্ বিন আমর বিন আতিয়া বিন হানসা আনসারী। তার মায়ের নাম ছিল উতায়লা বিনতে কায়েস। (হযরত) সুরাকাহ্ আনসারের সম্মানিত গোত্র বনু নাজ্জারের সদস্য ছিলেন। তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে মহানবী (সা.)-এর হিজরতের কিছুকাল পূর্বে আর কারো কারো মতে মহানবী (সা.)-এর হিজরতের স্বল্পকাল পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) আমরের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস মেহজা' এবং সুরাকাহ্ বিন আমরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। তিনি বদর, উহুদ, পরিখা এবং খায়বারের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া তার হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং উমরাতুল কাযার সময়ও মহানবী (সা.)-এর সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য হয়। হযরত সুরাকাহ্ বিন আমর সেসব সৌভাগ্যবান সাহাবীর একজন ছিলেন যাদের বয়আতে রিযওয়ানে যোগ দেয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। তার বংশধারা বিস্তার লাভ করে নি। যেমনটি আমি বলেছি, অষ্টম হিজরীতে মূতার যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। {আল্ ইস্তিআব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৮০, সুরাকাহ্ বিন আমর (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ জিল থেকে ১৯৯২ সালে মুদ্রিত}, {আল্ ইসাবাহ ফী তামীযিস্ সাহাবাহ্, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪, সুরাকাহ্ বিন আমর (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে মুদ্রিত}, {আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৩, সুরাকাহ্ বিন আমর (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}, {উয়ুনুল আসার, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৩৩, যিকরুল মওয়াখাতে, বৈরুতের দ্বারুল্ কলম থেকে ১৯৯৩ সালে মুদ্রিত]

আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত আব্বাদ বিন কায়েস (রা.)। তিনিও অষ্টম হিজরীতে মূতার যুদ্ধে ইন্তেকাল করেন। তার নাম সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। তার নাম উবাদা বিন কায়েস বিন আয়শাহ্ও পাওয়া যায় আর একইভাবে তার দাদার নাম আবাসাহ্ও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। হযরত আব্বাদ হযরত আবু দারদা (রা.)'র চাচা ছিলেন। হযরত আব্বাদ (রা.) বদর, উহুদ, পরিখা এবং খায়বারের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন আর হুদায়বিয়ার সন্ধিতেও তিনি যোগ দিয়েছেন। আর মূতার যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। **আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪০৩, উবাদা বিন কায়েস (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}, {উসদুল গাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৪, আব্বাদ বিন কায়েস (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত}**

এরপর রয়েছেন হযরত আবুয্ যিয়াহ্ বিন সাবেত বিন নু'মান। তিনি সপ্তম হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। এক বর্ণনায় তার নাম উমায়ের বিন সাবেত বিন নু'মান বিন উমাইয়্যা বিন ইমরাউল কায়েস এবং অন্য রেওয়ায়েত অনুসারে তার নাম নু'মান বিন সাবেত বিন ইমরাউল কায়েস বর্ণিত হয়েছে। তিনি তার ডাক নামে বেশি পরিচিত আর তা হলো আবুয্ যিয়াহ্। বদর, উহুদ, পরিখার যুদ্ধ এবং হুদায়বিয়ায় তিনি অংশ গ্রহণ করেন আর সপ্তম হিজরীতে খায়বারের যুদ্ধে সময় শাহাদত বরণ করেন। বলা হয় যে, এক ইহুদী তার মাথায় আঘাত করে যার ফলে তার মাথা ফেটে যায় এবং তিনি শাহাদত বরণ করেন। **{উসদুল গাবাহ্, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৭৫, আবুয্ যিয়াহ্ বিন সাবেত (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত}, {আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৪-৩৬৫, আবু যিয়াহ্ (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}**

এরপর রয়েছেন হযরত আনাসা (রা.), তার ইন্তেকালও বদরের যুদ্ধে হয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফত পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। যাহোক, তিনি মহানবী (সা.)-এর মুক্তকৃত ইথিওপিয়ান ক্রীতদাস ছিলেন। তার নাম ছিল আনাসা আর আবু আনাসাও বর্ণিত হয়েছে। কারো কারো মতে তার ডাকনাম ছিল আবু মাসরূহ্। হযরত আনাসা ইসলামের সূচনাতেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং হিজরতের সময় মদীনায় যান আর হযরত সা'দ বিন খায়সামার আতিথ্য গ্রহণ করেন। আর যতদিন জীবিত ছিলেন, মহানবী (সা.)-এর সেবায় নিয়োজিত থাকা তার সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজ ছিল। মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বসতে গেলেও মহানবী (সা.)-এর অনুমতি নিয়ে বসতেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ নেন। **{উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০১-৩০২, আনসাহ্ (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত}, (শাহ্ মঈনুদ্দীন আহমদ নদভী রচিত সিয়ারুস্ সাহাবাহ্, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৫৮৭, করাচীর দ্বারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত), {আল্ ইসাবাহ্ ফী তামীযিস্ সাহাবাহ্, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৮৩, আনসা মওলা রসূলুল্লাহ্ (সা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে মুদ্রিত}**

এরপর রয়েছেন হযরত আবু কাবশাহ্ সুলায়েম (রা.), তার ডাক নাম হলো আবু কাবশাহ্। হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে তার ইন্তেকাল হয়। কারো কারো মতে তার নাম ছিল সালামাহ্। তিনি মহানবী (সা.)-এর মুক্তকৃত পারস্য বংশীয় ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি বদরী সাহাবী, তিনি অওস বসতিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার দেশ এবং বংশ (পরিচয়) সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। কেউ বলে তিনি পার্সিয়ান, কেউ বলে দাওসী আবার কেউ বলে মক্কী। ইসলামের সূচনাকালেই ইসলামগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং হিজরতের অনুমতি লাভের পর মদীনায় চলে যান। বদরসহ সকল যুদ্ধে তিনি মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। **{আল্ ইসাবাহ্ ফী তামীযিস্ সাহাবাহ্, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৪, আবু কাবশাহ্ (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে মুদ্রিত}, (শাহ্ মঈনুদ্দীন আহমদ নদভী রচিত সিয়ারুস্ সাহাবাহ্, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৫৭৯, করাচীর দ্বারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত)**

হযরত আবু কাবশাহ্ (রা.) যখন মদীনায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন তখন তিনি কুলসুম বিন আল্ হিদামের বাড়িতে অবস্থান করেন। আরেক রেওয়ায়েত অনুসারে তিনি হযরত সা'দ বিন খায়সামার কাছে অবস্থান করেন। হযরত উমর (রা.)'র খলীফা মনোনীত হওয়ার আগের দিন হযরত আবু কাবশাহ্'র ইন্তেকাল হয়। এটি ত্রয়োদশ হিজরীর ২২ জমাদিউস সানীর কথা। **{আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ৩৬, আবু কাবশাহ্ (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}**

এরপর রয়েছেন হযরত মারসাদ বিন আবী মারসাদ (রা.)। তৃতীয় হিজরীর সফর মাসে রাজী' নামক স্থানে তার ইন্তেকাল হয়। তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন। তিনি হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিবের মিত্র ছিলেন। তিনি তার পিতার সাথে বদরের (যুদ্ধে) যোগ দিয়েছিলেন। ইসলামের প্রারম্ভেই তিনি ইসলাম গ্রহণের সম্মান লাভ করেন

আর বদরের যুদ্ধের পূর্বেই হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন। মহানবী (সা.) হযরত অওস বিন সামেতের সাথে তার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠা করেন। বদরের (যুদ্ধের) দিন তিনি **'সাবাল'** নামক ঘোড়ায় চড়ে উপস্থিত হন। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, হযরত মারসাদ (রা.) সেই সৈন্যদলের সেনাপতি ছিলেন যেটিকে মহানবী (সা.) রাজী' অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। এ ঘটনাটি তৃতীয় হিজরীর সফর মাসে ঘটে, আবার কারো কারো মতে এই সৈন্যদলের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আসেম বিন সাবেত। **{আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৪-৩৬৫, আবু মারসাদ (রা.) মারসাদ বিন আবী মারসাদ (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}, {উসদুল গাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩, মারসাদ বিন আবী মারসাদ (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত}**

তার শাহদাতের ঘটনার বিবরণ হলো, বনু আযাল এবং কার্‌রা গোত্র ইসলামগ্রহণের ভান করে মহানবী (সা.)-এর সমীপে ধর্মীয় শিক্ষাদানের জন্য কয়েকজন মুয়াল্লিম বা শিক্ষক প্রেরণের আবেদন করলে তিনি (সা.) (এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে মতভেদ রয়েছে) হযরত মারসাদ (রা.) বা হযরত আসেম (রা.)'র নেতৃত্বে একটি দল প্রেরণ করেন। তারা রাজী' নামক স্থানে পৌঁছতেই বনু হুযায়েল (গোত্র) নগ্ন তরবারি নিয়ে সামনে দাঁড়ায় এবং বলে, আমাদের উদ্দেশ্য তোমাদের হত্যা করা নয় বরং তোমাদের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের কাছ থেকে সম্পদ আহরণ করতে চাই, আর আমরা তোমাদের জীবনের নিরাপত্তার অঙ্গীকার করছি। একথা শুনে হযরত মারসাদ (রা.), খালেদ (রা.) এবং আসেম (রা.) বলেন, তোমাদের অঙ্গীকারের প্রতি আমাদের কোন আস্থা নেই আর এভাবে যুদ্ধ করতে করতে তারা তিন জনই জীবন উৎসর্গ করেন। **(শাহ্ মঈনুদ্দীন আহমদ নদভী রচিত সিয়ারুস্ সাহাবাহ্, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৫৫৫, করাচীর দ্বারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত)**

আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত আবু মারসাদ কান্নায বিন আল্ হোসাঈন গানওয়া (রা.)। দ্বাদশ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। কারো কারো মতে তার কুনিয়ত বা ডাকনাম ছিল আবু হিছ্ন। তিনি সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। ইসলামের সূচনা লগ্নেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরতের অনুমতি পাওয়ার পর মদীনায় চলে আসেন। মহানবী (সা.) হযরত উবাদা বিন সামেতের সাথে তার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দেন। **(শাহ্ মঈনুদ্দীন আহমদ নদভী রচিত সিয়ারুস্ সাহাবাহ্, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৫৮১, করাচীর দ্বারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত), {আল্ ইসাবাহ্ ফী তামীযিস্ সাহাবাহ্, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৫, আবু মারসাদুল গানওয়া (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে মুদ্রিত}**

হযরত আবু মারসাদ (রা.) এবং তার পুত্র মারসাদ যখন মদীনা অভিমুখে হিজরত করেন তখন (তারা) উভয়ই হযরত কুলসুম বিনুল হাদামের নিকট অবস্থান করেন। কারো কারো মতে তারা উভয়েই সা'দ বিন খায়সামার বাড়িতে অবস্থান করেন। হযরত আবু মারসাদ (রা.) সকল যুদ্ধেই মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। **{আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪-৩৫, আবু মারসাদ (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}**

ইতিহাসে হযরত আবু মারসাদ (রা.)'র যে পদমর্যাদা স্বীকৃত রয়েছে তা হলো, মক্কা বিজয়ের পূর্বে হাতেব বিন আবী বালতায়া যখন তার স্ত্রী-সন্তানদের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে মক্কাবাসীকে গোপনে একটি পত্রের মাধ্যমে সংবাদ দিতে চান তখন মহানবী (সা.) সেটি অবগত হন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে অবহিত করেন। তাই তিনি (সা.) তিনজন অশ্বারোহীকে সেই মহিলাকে (ধরার) উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যে পত্র নিয়ে যাচ্ছিল। এই অশ্বারোহীরা সেই পত্রটি উদ্ধার করতে সমর্থ হন আর সেই অশ্বারোহীদের একজন ছিলেন হযরত আবু মারসাদ (রা.)। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমাকে এবং আবু মারসাদ গানওয়া ও যুবায়েরকে প্রেরণ করেন আর আমরা অশ্বারোহী ছিলাম। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা যাত্রা করো আর **'রওযায়ে খাখ'** নামক স্থানে পৌঁছার পর, (এটি একটি জায়গা) তোমরা সেখানে মুশরিকদের এক মহিলাকে পাবে, যার কাছে হযরত হাতেব বিন আবী বালতায়া'র পক্ষ থেকে মুশরিকদের নামে একটি পত্র রয়েছে, এটি বুখারীর হাদীস। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব ফাযলু মান শাহেদা বাদরান, হাদীস নম্বর: ৩৯৮৩)**

তিনি মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে একটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন। মুসলিম এবং বাগভী ইত্যাদি গ্রন্থে তার এই হাদীসটি রয়েছে। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা কবরের ওপর বসবে না আর কবরের দিকে মুখ করে নামাযও পড়বে না। **{আল্ ইসাবাহ্ ফী তামীযিস্ সাহাবাহ্, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৫, আবু মারসাদুল গানওয়া (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে মুদ্রিত}**

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র খিলাফতকালে দ্বাদশ হিজরীতে ৬৬ বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়। **(শাহ্ মঈনুদ্দীন আহমদ নদভী রচিত সিয়ারুস্ সাহাবাহ্, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৫৮১, করাচীর দ্বারুল্ এশায়াত থেকে প্রকাশিত)**

আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত সালীত বিন কায়েস বিন আমর (রা.)। চতুর্দশ হিজরীতে তার ইন্তেকাল হয়। তার পুরো নাম হযরত সালীত বিন কায়েস বিন আমর বিন উবায়েদ বিন মালেক। হযরত সালীত বিন কায়েস এবং হযরত আবু সিরমাহ্ উভয়েই ইসলামগ্রহণের পর বনু আদী বিন নাজ্জার বংশের প্রতিমা ভেঙে ফেলেন। মহানবী (সা.) হিজরত করে মদীনায় পৌঁছার পর তিনি (সা.) যখন উটে বসে মদীনা শহরে প্রবেশ করছিলেন তখন সব গোত্রই আকাঙ্ক্ষা করছিল মহানবী (সা.) যেন তাদের বাড়িতে অবস্থান করেন। তাঁর উট যখন বনু আদীর বাড়ির কাছে পৌঁছে আর তারা ছিলেন মহানবী (সা.)-এর মামা, কেননা আব্দুল মুত্তালিবের মা সালমা বিনতে আমর এই গোত্রেরই সদস্যা ছিলেন। তখন হযরত সালীত বিন কায়েস, আবু সালীত এবং উসায়রাহ্ বিন আবু খারেজাহ্ (সেই উটকে) থামাতে চাইলে মহানবী (সা.) বলেন, আমার উটনীকে ছেড়ে দাও, এটি এখন প্রত্যাদিষ্ট, অর্থাৎ আল্লাহ্ যেখানে চাইবেন এটি নিজেই সেখানে বসে পড়বে। হযরত সালীত (রা.) বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। চতুর্দশ হিজরীতে হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে জিসর আবী উবায়েদের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। **{আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৮, সালীত বিন কায়েস (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}, {সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ২২৯, বাব হিজরাতুর্ রসূল (সা.), বৈরুতের দ্বার ইবনে হাযম থেকে ২০০৯ সনে মুদ্রিত}**

হযরত মুজায্যার বিন যিয়াদ (রা.) উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। মুজায্যার তার উপাধি ছিল, এর অর্থ হলো স্থূল দেহের অধিকারী। মহানবী (সা.) হযরত মুজায্যার এবং আকেল বিন বুকায়ের–এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করিয়েছিলেন। অন্যত্র এসেছে মহানবী (সা.) হযরত মুজায্যার এবং হযরত উক্কাশাহ্ বিন মিহসানের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন। হযরত মুজায্যার বদর এবং উহুদের যুদ্ধে যোগদান করেন। **{আল্ ইসাবাহ্ ফী তামীযিস্ সাহাবাহ্, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭২-৫৭৩, আল্ মুজায্যার বিন যিয়াদ (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে মুদ্রিত},{আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪১৭, আল্ মুজায্যার বিন যিয়াদ (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}, {উয়ূনুল আসার, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৩২-২৩৩, বাবু যিকরুল্ মওয়াখাতে, বৈরুতের দ্বারুল্ কলম থেকে ১৯৯৩ সালে মুদ্রিত}**

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) আবু বাখতারীকে হত্যা করতে বারণ করেছিলেন, কেননা মক্কায় মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দিতে সে মানুষকে বাধা দিয়েছিল {এর প্রতিদানে মহানবী (সা.) বলেন, তাকে হত্যা করবে না} আর সে নিজেও মহানবী (সা.)-কে কোন কষ্ট দিত না এবং সে সেসব লোকের একজন ছিল যারা সেই চুক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল যা কুরাইশরা বনু হাশেম এবং বনী মুত্তালিবের বিরুদ্ধে করেছিল। হযরত মুজায্যার (রা.) আবু বাখতারীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, মহানবী (সা.) আমাদেরকে তোমাকে হত্যা করতে বারণ করেছেন। আবু বাখতারীর সাথে তার এক সঙ্গীও ছিল যে তার সাথে মক্কা থেকে বেরিয়েছিল, তার নাম ছিল জুনাদাহ্ বিন মুলাইহা আর সে বনু লাইসের সদস্য ছিল। আবু বাখতারীর নাম ছিল আ'ছ। সে বলে, আমার এই সঙ্গীর ব্যাপারে কী নির্দেশ? হযরত মুজায্যার (রা.) বলেন, না, আল্লাহ্‌র কসম! তোমার সঙ্গীকে আমরা ছাড়ব না। মহানবী (সা.) শুধু তোমার একার ব্যাপারে আমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন। সে বলে, মরলে আমরা উভয়ে এক সাথেই মরব। মক্কার মহিলারা একথা বলে বেড়াবে যে, নিজের জীবনের জন্য আমি আমার বন্ধুকে পরিত্যাগ করেছি– এটি আমি সহ্য করতে পারব না। এরপর তারা উভয়েই (হযরত মুজায্যারের) সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় আর যুদ্ধে হযরত মুজায্যার তাকে হত্যা করেন। পরে হযরত মুজায্যার (রা.) মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে বলেন, সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি তাকে খুবই জোর দিয়ে বলেছি, সে যেন নিজেকে ধরা দেয় আর আমি তাকে আপনার কাছে নিয়ে আসি কিন্তু সে এতে সম্মত হয় নি আর অবশেষে সে আমার সাথে যুদ্ধ করে আর আমি তাকে হত্যা করি। **{উসদুল গাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯-৬০, আল্ মুজায্যার বিন যিয়াদ (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত}, {উয়ূনুল আসার, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩০১, বাবু গযওয়ায়ে বদর, বৈরুতের দ্বারুল্ কলম থেকে ১৯৯৩ সালে মুদ্রিত}**

হযরত মুজায্যার (রা.)'র সন্তান-সন্ততিরা মদীনা এবং বাগদাদে বসবাস করত। আবী ওয়াজযাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, উহুদের যে তিনজন শহীদকে একই কবরে সমাহিত করা হয়েছিল তারা হলেন, হযরত মুজায্যার

বিন যিয়াদ, নু'মান বিল মালেক এবং আব্দাহ্ বিন হাসহাস। {আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪১৭, আল্ মুজায্যার বিন যিয়াদ (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}

কিন্তু একটি রেওয়ায়েতে এটিও পাওয়া যায় যে, হযরত আনীসাহ্ বিনতে আদী মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পুত্র আব্দুল্লাহ্ বদরী সাহাবী, উহুদের যুদ্ধে সে শহীদ হয়েছে। আমার পুত্রকে আমি আমার বাড়ির কাছে সমাহিত করতে চাই যাতে তার সাথে আমার সান্নিধ্য বজায় থাকে। হুযূর (সা.) অনুমতি প্রদান করেন কিন্তু একই সাথে আব্দুল্লাহ্‌র সাথে তার বন্ধু হযরত মুজায্যারকেও একই কবরে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত হয়। অতএব, উভয় বন্ধুকে একই কম্বলে আবৃত করে উটের পিঠে করে মদীনায় পাঠানো হয়। তাদের মাঝে আব্দুল্লাহ্ ছিলেন কিছুটা হালকা-পাতলা গড়নের আর মুজায্যার ছিলেন মোটাসোটা ও স্থূলকায়। এটিও রেওয়ায়েতে এসেছে যে, উটের পিঠে তারা দু'জন বরাবর ছিল অর্থাৎ উভয়ের ওজন সমান ছিল। যারা (উট থেকে) নামিয়েছেন তারা এতে বিস্ময় প্রকাশ করে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, উভয়ের পুণ্যকর্ম তাদেরকে সমান করে দিয়েছে। {উসদুল গাবাহ্, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩১, আনীসাহ্ বিনতে আদী (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত}

আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত হুবাব বিন মুনযের বিন জামুহ্ (রা.)। হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে তার মৃত্যু হয়। হযরত হুবাব বিন মুনযের (রা.) বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ বাকি সব যুদ্ধেই মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে অবিচল থাকেন আর মৃত্যুর শর্তে তাঁর হাতে বয়আত করেন। {উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬৫, হুবাব বিন মুনযের (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত}, {আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪২৮, হুবাব বিন মুনযের (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}

তার সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে লিখেছেন যে, **"ইসলামী সেনাবাহিনী যেখানে শিবির স্থাপন করেছিল তা খুব একটা ভালো জায়গা ছিল না, তখন হযরত হুবাব বিন মুনযের (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, এ জায়গাটি কি আপনি ঐশী এলহাম অনুসারে পছন্দ করেছেন নাকি কেবল সামরিক কৌশলের অংশ হিসেবেই এমনটি করেছেন? তখন মহানবী (সা.) বলেন, এ সম্পর্কে কোন ঐশী নির্দেশ নেই। তুমি কোনো পরামর্শ দিতে চাইলে দিতে পার। তখন হযরত হুবাব বিন মুনযের (রা.) নিবেদন করেন, তাহলে আমার মতে এই জায়গাটি উপযুক্ত নয় বরং সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কুরাইশের নিকটবর্তী জলাধারটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেওয়াই উত্তম হবে। সেই জলাধারটি কোথায় তা আমি জানি, এর পানিও ভালো আর সাধারণত থাকেও যথেষ্ট পরিমাণে। মহানবী (সা.) এই প্রস্তাবটি পছন্দ করেন। যেহেতু তখনো কুরাইশরা টিলার অপর দিকে তাঁবু গেড়ে রেখেছিল আর এই জলাধারটি খালিই পড়ে ছিল, তাই মুসলমানরা এগিয়ে গিয়ে জলাধারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। কিন্তু যেভাবে পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তখন সেই জলাধারেও খুব বেশি পানি ছিল না এবং মুসলমানরা পানির স্বল্পতা অনুভব করছিল। এছাড়াও উপত্যকার যে প্রান্তে মুসলমানরা ছিল তাও খুব একটা ভালো জায়গা ছিল না, কেননা সেদিকে অনেক বেশি বালি ছিল, যে কারণে ঠিকমত দাঁড়ানো যেত না। এরপর আল্লাহ্ তা'লার এমন কৃপা হয় যে, কিছুটা বৃষ্টিও হয় যাতে মুসলমানেরা চৌবাচ্চার মত বানিয়ে বানিয়ে পানি জমা করার সুযোগ পায়। এছাড়া এই সুবিধাও হয় যে, বালি শক্ত হয়ে যায় এবং পা বালিতে দেবে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। অপর দিকে কুরাইশদের অংশের জায়গা কর্দমাক্ত হয়ে যায় এবং সে দিকের পানিও কিছুটা ময়লা ও ঘোলাটে হয়ে যায়।"** {হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.), পৃঃ ৩৫৬-৩৫৭}

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত জিব্রাইল মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হন এবং বলেন, হযরত হুবাব বিন মুনযের (রা.) পরামর্শস্বরূপ যে মতামত দিয়েছেন তা-ই সঠিক। মহানবী (সা.) বলেন, হে হুবাব! তুমি বুদ্ধিদীপ্ত পরামর্শ দিয়েছ। বদরের যুদ্ধে খাযরাজ গোত্রের পতাকা হযরত হুবাব বিন মুনযের (রা.)'র হাতে ছিল। হযরত হুবাব বিন মুনযের (রা.) যখন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তখন তার বয়স ছিল ৩৩ বছর।

(আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০, গযওয়ায়ে বদর, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত)

তার সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে আরো লিখেছেন যে, "মহানবী (সা.) যখন তাঁর গোয়েন্দাদের কাছ থেকে কুরাইশ বাহিনীর নিকটে এসে যাওয়ার সংবাদ পান তখন

তিনি তাঁর এক সাহাবী হযরত হুবাব বিন মুনযের (রা.)-কে প্রেরণ করেন শত্রু বাহিনীর সংখ্যা এবং শক্তি সম্পর্কে ধারণা সংগ্রহের জন্য। তখন তিনি (সা.) তাকে তাগিদপূর্ণ নসীহত করে বলেন, শত্রু যদি বেশি শক্তিশালী হয় এবং মুসলমানদের জন্য আশঙ্কার কারণ হয় তাহলে ফিরে এসে বৈঠকে তা বলবে না যে, তাদের সংখ্যা অনেক বেশি বরং পৃথকভাবে অবহিত করবে যেন এর ফলে মুসলমানদের মাঝে কোন প্রকার ভীতির সঞ্চার না হয়। হুবাব (রা.) চুপিসারে যান এবং অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে স্বল্পসময়ে ফিরে এসে পুরো পরিস্থিতি মহানবী (সা.)-কে অবহিত করেন। **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.) রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.), পৃ: ৪৮৪}**

ইয়াহ্ইয়া বিন সা'দ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) যখন কুরাইযাহ্ এবং নযীরের যুদ্ধের সময় মানুষের কাছে পরামর্শ আহ্বান করেন তখন হযরত হুবাব বিন মুনযের (রা.) দাঁড়িয়ে নিবেদন করেন, আমার মত হলো, মহল্লাসমূহের মাঝে আমাদের শিবির স্থাপন করা উচিত। (অর্থাৎ তাদের অতি নিকটে যাওয়া উচিত যেন সেখানকার সব কথা অবগত হওয়া যায় এবং সঠিকভাবে তদারকি করাও সম্ভব হয়) মহানবী (সা.) তার পরামর্শ অনুসারে কাজ করেন। হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে তার ইন্তেকাল হয়। **{আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৭-৪২৮, হুবাব বিন মুনযের (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}**

মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের সময় মুসলমানদের যে পরিস্থিতি ছিল তা হযরত আবু বকর (রা.) যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন সেই ঘটনা হলো, "হযরত আবু বকর (রা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা এবং গুণকীর্তন করেন এবং বলেন, দেখ! যারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পূজা বা উপাসনা করত তারা কান খুলে শুনে নাও, মুহাম্মদ (সা.) নিশ্চয়ই ইন্তেকাল করেছেন আর যারা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করত তারা মনে রেখো, আল্লাহ্ তা'লা জীবিত আর তিনি কখনোই মৃত্যুবরণ করবেন না। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) এই আয়াত পাঠ করেন, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ। অর্থাৎ তুমিও মরণশীল এবং তারাও মরণশীল। তারপর তিনি এ আয়াতও পাঠ করেন, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.) কেবল একজন রসূল, তাঁর পূর্বের সকল রসূল ইন্তেকাল করেছেন, অতএব তিনি (সা.)ও যদি মারা যান বা নিহত হন তাহলে তোমরা কি তোমাদের গোড়ালিতে ফিরে যাবে? যে নিজের গোড়ালিতে ফিরে যাবে, সে আদৌ আল্লাহ্র ক্ষতি করতে পারবে না আর অচিরেই আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন। **(সূরা আলে ইমরান: ১৪৫)**

সোলায়মান বলেন, একথা শুনে মানুষ এতটাই কাঁদে যে, (তাদের) হেঁচকি উঠে যায়। সোলায়মান বলেন, আনসাররা বনী সায়েদার বাড়িতে হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)'র বাড়িতে একত্রিত হয় এবং বলে, একজন আমীর আমাদের মধ্য থেকে এবং আরেকজন আমীর তোমাদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হোক। হযরত আবু বকর, হযরত উমর বিন খাত্তাব এবং হযরত আবু উবায়দা বিন আল্ জারাহ্ (রা.) তাদের কাছে যান। হযরত উমর (রা.) কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তাকে থামিয়ে দেন। হযরত উমর (রা.) বলতেন যে, খোদার কসম! আমি যা কিছু বলতে চাচ্ছিলাম তার জন্য আমি আমার পছন্দমত বক্তৃতা প্রস্তুত করেছিলাম, আমার আশঙ্কা ছিল যে, হযরত আবু বকর (রা.) সেই গভীরতায় গিয়ে কথা বলতে পারবেন না অর্থাৎ সেভাবে কথা বলতে পারবেন না। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) বক্তৃতা করেন আর এমন বক্তৃতা করেন যা বাগ্মীতায় সবার বক্তৃতার ঊর্ধ্বে ছিল। তিনি তাঁর বক্তৃতায় এটিও বলেন, আমরা আমীর আর তোমরা হলে উযির। হুবাব বিন মুনযের (রা.) একথা শুনে বলেন, মোটেই নয়। এখানে এটি উল্লেখ করার কারণ হলো, এখানে হুবাব বিন মুনযের (রা.)'র উল্লেখ রয়েছে। হুবাব বিন মুনযের (রা.) একথা শুনে বলেন, মোটেই নয়, আল্লাহ্র কসম! মোটেই নয়। খোদার কসম! আমরা এমনটি করব না বরং আমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর হবেন আর একজন আমীর আপনাদের মধ্য থেকে হবেন। অর্থাৎ একজন কুরাইশ থেকে এবং আরেকজন আনসারদের মধ্যে থেকে হবেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, না বরং আমীর আমরা আর উযির তোমরা। কেননা বংশমর্যাদায় পুরো আরবের মাঝে কুরাইশরাই সবচেয়ে উত্তম আর বংশধারায় তারা প্রাচীন আরব, তাই তোমরা উমর বা আবু উবায়দার হাতে বয়আত করে নাও। হযরত উমর (রা.) বলেন, না, আমরা আপনার হাতে বয়আত করব; কেননা আপনি আমাদের নেতা এবং আমাদের চেয়ে উত্তম আর মহানবী (সা.)-এর কাছে আপনি আমাদের চেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন। একথা বলে হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র হাত ধরেন এবং তাঁর হাতে বয়আত করেন আর মানুষজনও

তাঁর হাতে বয়আত করেন। তখন সবাই (তাঁর হাতে) বয়আত করেন। {সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ফাযায়েলে আসহাবিন্ নবী (সা.) বাবু কওলিন্ নবী লাও কুনতা মুত্তাখিযান খলীলা, হাদীস নং: ৩৬৬৮}

হযরত হুবাব বিন মুনযের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত জিব্রাঈল (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে এসে নিবেদন করেন, এই দু'টি কথার মাঝে কোনটি আপনার বেশি প্রিয়? একটি হলো, আপনি নিজের সাহাবীদের সাথে পৃথিবীতে বসবাস করুন অথবা স্বীয় প্রভুর দিকে সেসব সত্য-প্রতিশ্রুতিসহ প্রত্যাবর্তন করুন, যা তিনি নিয়ামত সমৃদ্ধ জান্নাতসমূহে যেসব স্থায়ী নিয়ামতের প্রতিশ্রুতি আপনাকে দিয়েছেন আর তারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা আপনি পছন্দ করেন এবং যার মাধ্যমে আপনার চোখ শীতল হবে। তখন মহানবী (সা.) সাহাবীদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের পরামর্শ কী বলো? সাহাবীরা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাদের সাথে থাকুন আর শত্রুদের দুর্বলতাসমূহ সম্পর্কে আমাদের অবগত করুন এবং আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন যাতে তিনি তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করেন আর আপনি আমাদেরকে ঐশী সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করবেন– এটিই আমরা অধিক পছন্দ করব। তখন মহানবী (সা.) হযরত হুবাব বিন মুনযের (রা.)'র দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমার কী হয়েছে যে, তুমি কিছুই বলছ না, একেবারে চুপচাপ বসে আছ। তিনি বলেন, আমি তখন নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার প্রভু আপনার জন্য যা পছন্দ করেছেন (আপনি) সেটিই অবলম্বন করুন। অতএব তিনি (সা.) আমার পরামর্শ পছন্দ করেন। (আল্ মুস্তাদরিক আলাস্ সহীহাঈন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৪৮৩, কিতাবু মা'রেফাতিস্ সাহাবা (রা.) যিকরু মানাকিবিল হুবাব বিন আল্ মুনযির (রা.), হাদীস নং: ৫৮০৩, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সনে মুদ্রিত)

এরপর আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত রিফাআহ্ বিন রাফে' বিন মালেক বিন আজলান (রা.)। তিনিও একজন আনসারী। হযরত আমীর মুয়াবিয়ার এমারতের প্রারম্ভিক দিনগুলোতে তিনি ইন্তেকাল করেন। হযরত রিফাআ বিন রাফে' বিন মালেক বিন আজলান (রা.)'র ডাকনাম হলো আবু মুআ'য। তার মা ছিলেন, উম্মে মালেক বিনতে উবাই বিন সলূল যিনি মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সুলুল–এর বোন ছিলেন। তিনি আকাবার বয়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদর, উহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধ আর বয়আতে রেযওয়ানসহ সকল যুদ্ধেই তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। তার দুই ভাই ছিল, খাল্লাদ বিন রাফে' এবং মালেক বিন রাফে', তারাও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। {উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭৯, রিফাআহ্ বিন রাফে' (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত}, {আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৪৪৭, রিফাআহ্ বিন রাফে' (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত}

হযরত মুআ'য তার পিতা হযরত রিফাআ' বিন রাফে' (রা.)'র বরাতে বর্ণনা করেন আর তার পিতা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। তিনি বলেন, জিব্রাঈল মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে বলেন, আপনি মুসলমানদের মাঝে বদরের যুদ্ধে যোগদানকারীদের কী মর্যাদা দেন? মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন, সর্বোত্তম মুসলমান বা এমনই কোনো বাক্য বলেছেন। হযরত জিব্রাঈল (আ.) বলেন, একইভাবে সেসব ফিরিশ্‌তাও শ্রেষ্ঠ যারা বদরের যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। এটি বুখারীর হাদীস। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু শুহুদিল মালাইকাহ্ বাদরান, হাদীস নং: ৩৯৯২)

ফিরিশ্‌তারা কীভাবে যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন? এ সম্পর্কে হযরত সৈয়্যদ যয়নুল আবেদীন শাহ্ সাহেব বুখারীর যে ভাষ্য লিখেছেন তাতে ফিরিশ্‌তাদের যুদ্ধে যোগ দেয়ার যে ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন তা হলো, "আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (সূরা আল্ আনফাল: ১৩) অর্থাৎ এটি সেই সময় ছিল যখন তোমার প্রভু ফিরিশ্‌তার প্রতিও ওহী করছিলেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি। অতএব মু'মিনদেরকে দৃঢ় বা অবিচল করো, আমি কাফিরদের হৃদয়ে ত্রাস সঞ্চার করব। হে মু'মিনেরা! তোমরা তাদের ঘাড়ে আঘাত করো এবং তাদের প্রতিটি আঙ্গুলে আঘাত করতে থাকো। **'যারবুল আ'নাক', 'যারবুর রিকাব' এবং 'যারবু কুল্লা বানান'–এর অর্থ হলো 'জোরালো আক্রমণ' যাতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাতের অর্থ রয়েছে।"** এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দু'তিনটি রেওয়ায়েত রয়েছে, এগুলো সম্পর্কে শাহ্ সাহেব বলেন, এই অধ্যায়ে যেসব হাদীস রয়েছে তাতে ফিরিশ্‌তাদের উপস্থিতি আর ফিরিশ্‌তা প্রত্যক্ষ করার বিষয়টি আসলে দিব্যদর্শন (অর্থাৎ দিব্যদর্শনরূপে হয়েছে) আর তাদের যুদ্ধও তেমনই যা তাদের অবস্থা সম্মত (অর্থাৎ ফিরিশ্‌তাদের অবস্থা সম্মত যুদ্ধ) তীর ও কামানের যুদ্ধ নয় (ফিরিশ্‌তারা কোনো তীর ও তরবারি ধারণ

করে নি।)। আর তাদেরকে আধ্যাত্মিক চোখে দেখা যায়, চর্ম চোখে নয়। মহানবী (সা.)ও দেখেছেন, আর সাহাবীরাও আর একইভাবে আল্লাহ্‌র ওলীরাও দেখে থাকেন। (শাহ্ সাহেব ব্যাখ্যা করছেন যে, ফিরিশ্‌তারা কীভাবে যুদ্ধ করে)- এই বিষয়টি ফিরিশ্‌তারই নিয়ন্ত্রণে ছিল। কুরাইশ নেতৃবৃন্দরা নাখলার ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এই ঘটনাই পরবর্তী যুদ্ধগুলোর কারণ হয় যাতে কুরাইশ কাফিরদের ধ্বংস সংক্রান্ত ঐশী নিয়তি পূর্ণতা লাভ করে। ফিরিশ্‌তাদের কর্মপন্থা আমাদের কর্মপন্থা থেকে পৃথক আর তাঁদের যুদ্ধরীতি আমাদের যুদ্ধরীতি থেকে ভিন্ন। বদরের প্রান্তরে শত্রুদের বিস্তৃর্ণ বালুকাময় টিলায় শিবির স্থাপন করা এবং অপেক্ষাকৃত নীচু উপত্যকায় মহানবী (সা.)-এর শিবির স্থাপন আর স্বল্প সংখ্যক সাহাবী শত্রুদের দৃষ্টির আড়ালে থাকা, এরপর বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া, সাহাবীদের একেকটি তীরের লক্ষ্যে আঘাত হানা, (সাহাবীরা যে তীরই ছুঁড়তেন সঠিক লক্ষ্যে গিয়ে আঘাত হানত।) প্রতিটি তীর কার্যকর সাব্যস্ত হওয়া, শত্রুর মাঝে ভয়ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার হওয়া, সাহাবীদের মনস্তুষ্টি (শত্রু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল আর সাহাবীরা দৃঢ়চিত্ততা এবং অবিচলতার সাথে যুদ্ধ করছিলেন) এসব কিছুই ফিরিশ্‌তাদের হস্তক্ষেপের অলৌকিক কৃষ্মা ছিল– যার সংবাদ আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে এই ভাষায় দিয়েছিলেন, **إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ** (সূরা আল্ আনফাল: ১০) অর্থাৎ সেই সময়কেও স্মরণ করো যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে মিনতি করতে। তখন তোমাদের প্রভু তোমাদের দোয়া শোনেন এবং বলেন, আমি সহস্র সহস্র ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে তোমাদের সাহায্য করব যারা দলের পর দল এগিয়ে আসবে।" এরপর তিনি লিখেন, "মহানবী (সা.)-এর দোয়া গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে বাহ্যিক উপকরণে যে গতির সঞ্চার হয় তাতে এক বিস্ময়কর নিরবচ্ছিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। এর বিভিন্ন অংশের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকালে ফিরিশ্‌তাদের এক বিশাল বাহিনীকে কর্মরত দেখা যায়। (তিনি বলেন) কে মহানবী (সা.)-কে স্পর্শকাতর মুহূর্তে নিরাপদে মক্কা মুকার্‌রমা থেকে বের করেছে, কে মক্কাবাসীদের উদাসীন রেখেছে, কে তাদেরকে সওর গুহা পর্যন্ত এনেও তাঁর পশ্চাদ্ধাবন থেকে কুরাইশকে নিরাশ অবস্থায় ফেরত পাঠায় আর কে মহানবী (সা.)-কে নিরাপদে মদীনা মুনওয়ারায় পৌঁছে দিয়েছে যা পরবর্তীতে ইসলামের উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়েছে?"

পুনরায় লিখেন, "**হিজরতের পর হযরত আব্বাস (রা.)'র মক্কায় মুশরিক অবস্থায় অবস্থান করা এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি পোষণ করা আর তাঁকে মদীনা মুনওয়ারায় কুরাইশের ষড়যন্ত্র এবং দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত করতে থাকা (অর্থাৎ হযরত আব্বাসের মাধ্যমে) এটিও ফিরিশ্‌তাদের কর্মকাণ্ডেরই একটি অংশ।**" (ফিরিশ্‌তারা এভাবেই কাজ করে।) এসব ঘটনার পিছনে ফিরিশ্‌তাদের কীর্তিই কার্যকর ছিল। মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন যুদ্ধ এবং বিজয় ও সফলতার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে এই ঈমান উদ্দীপক আয়াতের তফসীর অর্থাৎ, **أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ** (সূরা আল্ আনফাল: ১০)

এরপর শাহ্ সাহেব আরো বলেন, "**হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল হযরত মওলানা নূর উদ্দীন সাহেব (রা.)'র কাছ থেকে আমি এক এক পাঠ করে সম্পূর্ণ সহীহ্ বুখারী পড়েছি। আর একইভাবে পবিত্র কুরআনও বেশ কয়েকবার দরসে শুনেছি এবং পড়েছি। তিনি** {অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)} **ফিরিশ্‌তা সম্পর্কে বলতেন, নূর উদ্দীনেরও ফিরিশ্‌তাদের সাথে বাক্যালাপের সম্মান লাভ হয়েছে আর ফিরিশ্‌তাদের জগৎ অত্যন্ত ব্যাপক জগৎ। মানুষের প্রতিটি বৃত্তি ও যোগ্যতার পেছনেও ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত রয়েছে। (মানুষের) দৈহিক ও অন্তর্দৃষ্টি, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক শ্রবণ শক্তি, স্পর্শ ও ধরার শক্তি, বিবেক ও বুদ্ধি এবং চিন্তা ও প্রণিধান শক্তির সাথে যদি ফিরিশ্‌তার সাহায্য ও একাত্মতা না থাকে তাহলে এসব শক্তি-সামর্থ্য অর্থহীন এবং ক্ষতিকর হয়ে থাকে।**" (সকল মানবীয় শক্তিসামর্থ্য ও শক্তিবৃত্তি ফিরিশতাদের সাহায্যেই কার্যকর হয়ে থাকে) তিনি আরো লিখেন, "**তীর ও গুলির লক্ষ্যে আঘাত হানা বা না হানা তখনই সঠিক হতে পারে যদি মানুষের বিবেকবুদ্ধি সঠিকভাবে কাজ করে এবং দূর ও কাছের দূরত্বের সঠিক ধারণা থাকে আর কাণ্ডজ্ঞান ঠিক থাকে, মনের জোর প্রবল না হলে তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।**" তিনি আরো লিখেন, {খলীফা আউয়াল (রা.)} বলতেন, প্রতিটি মানসিক এবং দৈহিক শক্তির পেছনে ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত আছে আর প্রত্যেক মানুষের বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের তারতম্যের নিরিখে তাদের প্রতিটি শক্তি-বৃত্তির ক্ষেত্রে ফিরিশ্‌তার কম-বেশি সম্পর্ক থাকে। **পবিত্র কুরআন বদরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তাদের**

সংখ্যা তিন হাজার আর উহুদের যুদ্ধের বরাতে পাঁচ হাজার বর্ণনা করেছে। এ পার্থক্য স্থান ও কালের ভিন্নতা এবং আবশ্যিকতার গুরুত্বের কারণে হয়েছে। বদরের যুদ্ধে শত্রুদের সংখ্যা কম এবং উহুদের যুদ্ধে বেশি আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে আশঙ্কাও বেশি ছিল এবং ফিরিশ্‌তাদের সুরক্ষাব্যবস্থাও বেশি সংখ্যায় অবতীর্ণ করার প্রতিশ্রুতি ছিল। (আল্লাহ্‌ তা'লা) বলেন, وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (সূরা আলে ইমরান : ১২৭) **অর্থাৎ প্রতিশ্রুত ঐশী সাহায্যের বিকাশ খোদা তা'লার আযীযিয়্যত ও হাকীমিয়্যত বৈশিষ্ট্যের আলোকে হয়েছে। এই উভয় বৈশিষ্ট্যই সুপরিকল্পনা, পূর্ণ বিজয় এবং দৃঢ়তার দাবি রাখে, যাতে সাহায্যের উপকরণের প্রতিটি আঙ্গিক একটি অন্যটির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে। এতে ধারাবাহিকতা ও দৃঢ়তা পাওয়া যায় আর তা সুদৃঢ় ঐশী পরিকল্পনার মাধ্যমে দৃঢ় ও মজবুত করা হয়।" (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু শুহুদিল মালাইকাতি বাদরা, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৭১, নাযারাতে ইশায়াত, রাবওয়া থেকে প্রকাশিত)**

কাজেই, এই হলো সেসব গভীর জ্ঞানগর্ভ বিষয় যা ফিরিশ্‌তাদের যুদ্ধ করা সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'লা বলেছেন যে, ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করেছিলেন; যারা যুদ্ধ করছিলেন। এমন নয় যে, ফিরিশ্‌তারা স্বয়ং (লোকদের) মারছিল। এছাড়া কারো কারো মতে এটিও বিভিন্ন রেওয়ায়েতে আছে যে, ফিরিশ্‌তারা যাদেরকে হত্যা করেছে বা আঘাত করেছে তাদের লক্ষণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল আর সাহাবীদের মাধ্যমে যাদের আঘাত লাগছিল তাদের লক্ষণও একেবারে ভিন্ন ছিল। **(ফাতহুল বারী, শরহে সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু শুহুদিল মালাইকাতি বাদরা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩১২, হাদীস নংঃ ৩৯৯২, করাচীর আরামবাগস্থ কাদিমী কিতাব খানা থেকে মুদ্রিত)**

এটি ভ্রান্ত ধারণা। মূল বিষয় হলো, ফিরিশ্‌তারা মানবীয় শক্তিবৃত্তিকে সঠিকভাবে নির্দেশনা প্রদান করে এবং তা যথাযথভাবে ব্যবহার করে আর ফিরিশ্‌তাদের পক্ষ থেকে যখন এসব কিছু ঘটতে তাকে তখন সেটিই হলো ফিরিশ্‌তাদের যুদ্ধ।

হযরত ইয়াহিয়া (রা.) হযরত মুআয বিন রিফাআ'র বরাতে বর্ণনা করেছেন, বদরী সাহাবীদের একজন ছিলেন হযরত রিফাআ (রা.) আর তার পিতা হযরত রাফে' (রা.) আকাবার বয়আতকারীদের একজন ছিলেন। হযরত রাফে' (রা.) তার পুত্র হযরত রিফাআ'কে বলতেন, আমার জন্য আকাবায় বয়আতকারীদের একজন হওয়ার চেয়ে বদরের যুদ্ধে যোগদান বেশি আনন্দ ও সম্মানের কারণ। অর্থাৎ আকবার বয়আতে অংশগ্রহণের চেয়ে বদরের যুদ্ধে যোগদান করা আমার জন্য অনেক বড় বিষয় এবং আমার জন্য অনেক সন্মানের কারণ। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব শুহুদিল মালাইকাতি বাদরা, হাদীস নংঃ ৩৯৯৩)**

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আমি এক বিশেষ সম্মান লাভ করেছি। হযরত রিফাআ বিন রাফে জামাল এবং সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)'র সাথে ছিলেন। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত জুবায়ের (রা.) যখন বসরা অভিমুখে সৈন্যবাহিনীর সাথে রওয়ানা হন তখন হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.)'র স্ত্রী উম্মুল ফযল বিনতে হারেস হযরত আলী (রা.)-কে তাদের রওয়ানা হওয়ার সংবাদ দেন। তখন হযরত আলী (রা.) বলেন, আশ্চর্জের বিষয় হলো; হযরত উসমান (রা.)'র ওপর লোকেরা আক্রমণ করে তাঁকে শহীদ করেছে আর কোন জোরজবরদস্তি ছাড়াই আমার হাতে বয়আত করেছে। অর্থাৎ আমি বয়আত করার জন্য জোর করি নি। মানুষজন আমার হাতে বয়আত করেছে আর তালহা (রা.) এবং জুবায়ের (রা.)ও আমার হাতে বয়আত করেছে আর বর্তমানে তারা সেনাদল সহ ইরাক অভিমুখে যাত্রা করেছে। এ প্রেক্ষিতে হযরত রিফাআ বিন রাফে' (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন আমাদের ধারণা ছিল, আমরা অর্থাৎ আনসার এই খিলাফতের বেশি অধিকার রাখি। কেননা আমরা মহানবী (সা.)-কে সাহায্য করেছি আর আমাদের পদমর্যাদা ধর্মের দিক থেকে মহান কিন্তু আপনারা বলেছিলেন, আমরা হিজরতকারীরা সর্বাগ্রে রয়েছি আর আমরা মহানবী (সা.)-এর বন্ধু এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত এবং আমরা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করাই যে, তোমরা মহানবী (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার বিষয়ে আমাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ো না। আর তোমরা এটাও খুব ভালোভাবে জানো যে, আমরা তখন তোমাদের হাতে (খিলাফতের বিষয়টি) ছেড়ে দিয়েছিলাম। (আমরা কোনো বিতর্ক করি নি আর আমরা খলীফার হাতে পূর্ণ আনুগত্যের সাথে বয়আত করেছি)" আর এর কারণ এটাই ছিল যে, আমরা যখন দেখি যে, সত্যের ওপর আমল হচ্ছে, আর ঐশী গ্রন্থের অনুসরণ করা হচ্ছে এবং মহানবী (সা.)-

এর সুন্নত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তখন আমাদের কাছে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না। এটি ছাড়া আমাদের আর চাওয়ারই বা কী ছিল আর আমরা আপনার হাতে বয়আত করেছি আর এটি থেকে সরে যাই নি। (আর পিছপা হই নি)। এখন আপনার বিরুদ্ধে তারা বিরোধিতা করছে যাদের চেয়ে আপনি উত্তম এবং বেশি পছন্দনীয়। অতএব আপনি আমাদেরকে আপনার নির্দেশ জানিয়ে দিন। ইত্যবসরে হাজ্জাজ বিন গাযিয়্যাহ আনসারী আসেন এবং তিনি বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সময় হাত ছাড়া হওয়ার পূর্বেই এ বিষয়টি নিয়ে ভাবা উচিত। আমি যদি মৃত্যুকে ভয় করি তাহলে আমার হৃদয় কখনো প্রশান্তি পাবে না। হে আনসার গোত্র! আমীরুল মু'মিনীনকে পুনরায় সাহায্য করো, যেভাবে তোমরা প্রথমবার মহানবী (সা.)-কে সাহায্য করেছিলে। আল্লাহ্‌র কসম! এই দ্বিতীয় সাহায্য প্রথম সাহায্যের ন্যায় হবে যদিও দুই সাহায্যের মাঝে প্রথম সাহায্য অবশ্যই শ্রেয়। **(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮০-২৮১, রিফাআ বিন রাফে' রাযিয়াল্লাহু আনহু, বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত)**

যাহোক, তার ইন্তেকাল হযরত আমীর মুয়াবিয়ার এমারতের প্রথম দিকে হয়। **(আল ইস্তিআব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯৭, রিফাআ বিন রাফে' রাযিয়াল্লাহু আনহু, বৈরুতেন দ্বারুল্ জীল থেকে ১৯৯২ সালে মুদ্রিত)**

এই ছিল সাহাবীদের স্মৃতিচারণ। গত খুতবায় বর্ণিত (একটি) ঘটনার বরাতেও আরো কিছুটা বিশদ ব্যাখ্যা আমি দিতে চাই। হযরত আম্মার (রা.) আমি সম্পর্কে বলেছিলাম যে, হযরত আমর বিন আ'স (রা.) তার মৃত্যুর পর অত্যন্ত আক্ষেপ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কেননা মহানবী (সা.)-কে তিনি বলতে শুনেছিলেন যে, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-কে বিদ্রোহী গোষ্ঠী হত্যা করবে, আর হযরত আমার বিন আ'স (রা.) এই কারণেও সংশয়ে ছিলেন যে, তিনি আমীর মুয়াবিয়ার পক্ষে ছিলেন আর হযরত আম্মার (রা.)-কে শহীদ করেছিল হযরত আমীর মুয়াবিয়ার সৈন্যরা। **(আল্ মুস্তাদরেক আলাস্ সহীহাঈন, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৭৪, কিতাবু মা'রেফাতিস সাহাবা, যিকরু মানাকেব, আম্মার বিন ইয়াসের রাযিয়াল্লাহু আনহু, হাদীস নং ৫৭২৬, ১৯৯৭ সনে দ্বারুল হারামায়েন এর নাশরে ওয়াত্ তওযী থেকে মুদ্রিত)**

যাহোক, এ বিষয়ে অনেকে প্রশ্ন করেন যে, তিনি যেহেতু বিদ্রোহী দলে ছিলেন, তাই তার নাম এত সম্মানের সাথে কেন নেয়া হয় আর হযরত আমীর মুয়াবিয়ারও জামা'তের বই পুস্তকেও একটা বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। প্রথম কথা হলো, সাহাবীদের যে পদমর্যাদা রয়েছে, তাদের সম্পর্কে এটি বলার অধিকার আমাদের নেই যে, ইনি ক্ষমা পাবেন আর ইনি ক্ষমা পাবেন না। যার ভুল বুঝাবুঝি বা ভুলের কারণে এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে, তার বিষয়টি আল্লাহ্‌র হাতে। মুসলমানরাও এর পরিণামও ভোগ করেছে। এই প্রশ্ন তাদের মাথায়ও আসত যারা সেই যুগে বসবাস করতেন, এরপর তারা নিজেদের অস্বস্তি দূর করার জন্য দোয়াও করে থাকবেন যে, (হে আল্লাহ্!) এটি কী হয়ে গেল, ইনিও সাহাবী আর তিনিও সাহাবী অথচ একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন আর আল্লাহ্‌র কাছে হয়ত তারা দিক নির্দেশনাও প্রার্থনা করেছেন আর খোদা তা'লা তাদেরকে পথ নির্দেশনা দিতেনও।

অতএব এমন একটি রেওয়ায়েত আছে (যা) আবু যোহা বর্ণনা করেন যে, আমর বিন শুরাহবীল আবু মায়সারা {যিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.)'র একজন যোগ্য ছাত্র ছিলেন} স্বপ্নে দেখেন যে, একটা সবুজ শ্যামল বাগান, তাতে কয়েকটি তাবু খাঁটানো ছিল। হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)ও তাতে ছিলেন এবং আরো কয়েকটি তাবু ছিল, যাতে যুলকালাও ছিল। আবু মায়সারা জিজ্ঞেস করেন, এটি কীভাবে সম্ভব হলো, এরা তো পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহ করেছিল, উত্তর আসে যে, তারা আল্লাহ্ তা'লাকে **'ওয়াসিউল মাগফিরাহ্'** অর্থাৎ অনেক বড় ক্ষমাশীল পেয়েছেন, তাই (তারা) এখন সেখানে সমবেত হয়েছেন। **(আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৩০২, কিতাবু কিতালি আহলিল বাগী, বাবুদ্ দলীল আলা ইন ফিয়াতুল্ বাগীয়াহ্...হাদীস নংঃ ১৬৭২০, বৈরুতের দ্বারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে মুদ্রিত)**

অতএব এ বিষয়গুলো এখন খোদা তা'লার হাতে ন্যস্ত। এসব বিষয় এবং মতভেদকে হৃদয়ে স্থান দেয়ার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। এসব বিষয় হৃদয়ে লালন করার এবং যুদ্ধের কারণেই মুসলমানদের মাঝে আন্তরিক দূরত্ব এবং ভেদাভেদ বৃদ্ধি পেতে থাকে আর এর কুফল আজও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। এসব বিষয় আমাদের জন্যও শিক্ষণীয়, এসব বিষয় হৃদয়ে লালন করার পরিবর্তে ঐক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হোন। একবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র বরাতে আমি যখন হযরত আমীর মুয়াবিয়ার কোনো ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম, তখন কোনো একটি আরব দেশ থেকে কেউ আমাকে লিখেছিল যে, তিনি তো বিদ্রোহী এবং হন্তারক দলের নেতা ছিলেন, তার নাম কেন এত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তাই তার জন্যও স্বপ্ন সংক্রান্ত যে রেওয়ায়েতটি রয়েছে তা উত্তর হিসেবে

যথেষ্ট যে, খোদা তা'লার ক্ষমা ও দয়ার গণ্ডি অত্যন্ত বিস্তৃত। তাদের সম্পর্কে কিছু বলার বা চিন্তা করার পরিবর্তে আমাদের আত্মসংশোধন করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও কোনো কোনো জায়গায় হযরত আমীর মুয়াবিয়ার প্রেক্ষাপটে প্রশংসনীয় কথা বলেছেন। **(মালায়েকাতুল্লাহ্, আনওয়ারুল উলূম, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৫৫২)**

অতএব আমাদেরকেও সেসব সম্মানিত বুযূর্গের ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করার পরিবর্তে সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। হযরত আমীর মুয়াবিয়া সম্পর্কে এক জায়গায় এটিও এসেছে যে, হযরত আলী (রা.) এবং তার মাঝে যুদ্ধ হচ্ছিল আর মতভেদ অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সে সময় তৎকালীন খ্রিষ্টান বাদশাহ্ ভাবলো, মুসলমানদের অবস্থা এখন দুর্বল, তাই সে (মুসলমানদের ওপর) আক্রমন করতে চায়। হযরত আমীর মুয়াবিয়া এটি জানতে পেরে বলেন, **তোমার ধারণা যদি এটিই হয়ে থাকে তাহলে স্মরণ রেখো, তুমি যদি মুসলমানদের ওপর আক্রমন করো তাহলে হযরত আলী (রা.)'র পতাকাতলে সর্বপ্রথম যুদ্ধকারী জেনারেল হবো আমি, যে তাঁর পতাকাতলে তাঁর পক্ষ থেকে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।** **(তফসীরে কবীর, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৩০)**

অতএব বিবেক বুদ্ধি খাটাও। যাহোক, এটিও তাদের পদমর্যাদা ছিল।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন সব সময় ঐক্যবদ্ধ থাকি আর ঐক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে পুণ্যের ক্ষেত্রে আরো অধিক অগ্রসর হই।

(সূত্র কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)